সমকাল | শুক্রবার ২১ ভাদ্র ১৪১৫, ৫ [illegible]ম্বর ২০০৮ | মুক্তমঞ্চ

উন্নয়ন

# আঞ্চলিক বৈষম্যপীড়িত পার্বত্য চট্টগ্রাম

এম আজিজুর রহমান

পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি ক্ষুদ্র জনপদের আবাসভূমি। জনসংখ্যার তুলনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় যথেষ্ট বেশি। এ এলাকা বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। যেমন খাগড়াছড়িসহ অন্যান্য পাহাড়ি এলাকায় তেল, গ্যাস, জ্বালানি সম্পৃক্ত বিভিন্ন খনিজ সম্পদ রয়েছে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের একটি বিশাল অংশ ধারণ করে আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানকার বনগুলোতে শাল, গজারি, টিকচামবুলসহ দামি কাঠ, বেত ও অন্যান্য গাছপালা রয়েছে। পর্যটন এলাকা হিসেবে কক্সবাজার ও সুন্দরবনের পরপরই চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান। এখানে বেশ কয়েকটি খরস্রোতা নদীসহ পানিপথ ও মহাসড়কের সুবিধা রয়েছে। যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ, পর্যটন সম্ভাবনা ও যোগাযোগের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও শুধু আঞ্চলিক বৈষম্যজনিত কারণে এ এলাকা উন্নয়ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এ বঞ্চনা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের বঞ্চনা নয়, সমগ্র দেশ এর নেতিবাচক ফল ভোগ করছে।

খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান- এ তিনটি পার্বত্য জেলা নিয়ে বাংলাদেশে একমাত্র বিস্তৃত পাহাড়ি এলাকা চট্টগ্রাম যাকে সংক্ষেপে চিটাগাং হিল ট্রাক্ট বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরে ও পূর্বে ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্য, পূর্বে ভারতের মিজোরাম, দক্ষিণ ও পূর্বে মিয়ানমার এবং পশ্চিমে চট্টগ্রামের অবস্থান। এ এলাকার আয়তন ১৩,১৮৪ বর্গ কিমি, যা সমগ্র দেশের আয়তনের শতকরা প্রায় ৯ ভাগ। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি তথ্য অনুযায়ী এ এলাকার লোকসংখ্যা প্রায় ১.০৪২ মিলিয়ন বা ১০ লাখ ৪২ হাজার, যা সমগ্র দেশের জনসংখ্যার শতকরা ০.৭৪ ভাগ মাত্র। যেখানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৫৩ জন বাস করে, সেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রতি বর্গকিলোমিটারে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা মাত্র ৭৯.০৪ জন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দারা জাতিগতভাবে মঙ্গোলিয়ান। মঙ্গোলিয়ান জাতিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন- চাকমা, টিপরা, মুরং, মগ ইত্যাদি। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৫৫০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বেঙ্গল ম্যাপের অংশ ছিল। এরপর পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথমে আরাকান রাজতন্ত্র, পরে ত্রিপুরা রাজতন্ত্র এবং পুনরায় আরাকান রাজতন্ত্রের অধীনে শাসিত হওয়ার পর ১৬৬৬-১৭৬০ সাল অবধি মোগল সাম্রাজ্যের দখলে থাকে। ১৭৬০ সালের পর থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সালের পর থেকে পাকিস্তান এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশের অংশবিশেষ হিসেবে চট্টগ্রাম জেলার কিছু অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পরিচিত হয়।

বাংলাদেশের আয়তনের শতকরা ৯ ভাগ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তৃতি হলেও এখানে সমগ্র দেশের জনসংখ্যার এক ভাগের কম লোক বসবাস করে থাকে। আয়তন ও জনসংখ্যার হিসাবে এখানে প্রাকৃতিক সম্পদের কমতি আছে একথা বলা ঠিক হবে না। সাধারণত পাহাড়ি এলাকায় গ্যাস, তেল ও জ্বালানিসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদ থাকার সম্ভাবনা থাকে। স্বাধীনতার আগে ১৯৬৯ সালে খাগড়াছড়িতে সিমুতাং গ্যাস ও তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে পাকিস্তানের ন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি। এ এলাকার খনিজ সম্পদের মধ্যে অন্যতম হলো বালি, পাথর ও কয়লা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র পাহাড়ি এলাকায় যেসব খরস্রোতা নদী রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো কর্ণফুলী, সাংগু এবং মাতামুহুরী। গ্যাস ও বিদ্যুতের সুবিধা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারলে এসব নদীর দু'ধারে বেসরকারিভাবে ছোট-বড় অনেক ধরনের শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম খরা ও মরুপ্রবণতামুক্ত থাকার কারণে এখানে শিল্প সহায়ক পরিবেশ বিরাজমান, যা

দেশের অনেক এলাকাতেই নেই। খরস্রোতা নদীপথের সুবিধা, বিদ্যুৎসহ সুলভমূল্যে বাঁশ, কাঠ, বেত ও সংশ্লিষ্ট উপকরণপ্রাপ্তির কারণে চন্দ্রঘোনায় পেপার মিল গড়ে উঠেছে। কৃত্রিমভাবে হলেও আমেরিকার অর্থায়নে কাপ্তাই লেকে একটি হাইড্রো পাওয়ার স্টেশন নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে, যার মাধ্যমে একদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, অন্যদিকে সুলভমূল্যে পানি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। এই পানি বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে বণ্টন করা হয়। এছাড়া এ এলাকায় ব্যাপকভাবে মৎস্য চাষ করে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় স্থল ও জলপথে যোগাযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকায় বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা স্থাপন, মৎস্য চাষ এবং সমান্তরালভাবে পশুপালন, দুগ্ধ খামার স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট এলাকার উন্নয়নের কথা ভাবা যেতে পারে। টিকচামবুল, গজারি, সেগুন, বেত, বাঁশসহ বিভিন্ন নামিদামি গাছের বনায়ন করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আবাসন শিল্পে নির্মাণসামগ্রী হিসেবে সরবরাহ করা যেতে পারে। এতে আবাসন শিল্পের খরচের সাশ্রয় হবে।

পাহাড়ি এলাকার মানুষ সমভূমির মানুষের তুলনায় পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এখানে উৎপাদনশীল মানুষের সংখ্যা কম। বিনিয়োগের পরিমাণ কম হওয়ার প্রধান কারণ নিরাপত্তার অভাব। পাকিস্তান আমল থেকে আজ অবধি কোনো সরকারই পার্বত্য উপজাতি বা আদিবাসী সম্প্রদায়কে আপন করতে পারেনি। আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণে তারা বরাবরই শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছে। এই বঞ্চনা তাদের বিদ্রোহী করে তুলেছে। বিদ্রোহ দমনে বিগত সরকারগুলো প্রচুর টাকা ব্যয় করেছে কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তেমন কোনো অর্থ ব্যয় করা হয়নি। অতীত স্মৃতিচারণ করে এখন সময় নষ্ট না করে তাৎক্ষণিক যা দরকার তাহলো সম্ভাবনাময় পার্বত্য চট্টগ্রামকে উৎপাদনমুখী করা। এজন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট ও নদীপথ তৈরি করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো খনন করে সারা বছর নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে গ্যাস, বিদ্যুৎ, জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবে এবং বনায়ন সম্প্রসারণ করে প্রকৃতি প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধাগুলো কাজে লাগাতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের শিল্প-কারখানা স্থাপনসহ শিক্ষা সম্প্রসারণ করে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীকে আঞ্চলিক ভাষাসহ বাংলা, ইংরেজি, কম্পিউটার ও প্রযুক্তিবিদ্যায় দক্ষ করে উৎপাদনমুখী করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী এশিয়ার অন্যান্য মেধাসম্পন্ন মঙ্গোলিয়ানদের মতোই মেধাবী। তাদের মেধার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে বাংলাদেশের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করানোর জন্য শিক্ষা, চাকরি, ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণ করে আদিবাসীদের মন থেকে বৈষম্যের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। পাহাড়ি জনগোষ্ঠী যখন থেকে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট হবে, যখন তাদের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হবে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তখনই দূর হবে নিরাপত্তাহীনতাজনিত কারণে সৃষ্ট অস্থিরতা। আর অস্থিরতা নিরসন হলেই বিনিয়োগকারীরা এ এলাকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে। শিল্পায়নে সমৃদ্ধ হবে পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং সার্বিকভাবে সমৃদ্ধ হবে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশ।

■ লেখক : উপাচার্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটি